Vol. 53 | No. 3 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ফররুখ আহমদের কবিতা : সমকালীন প্রসঙ্গ

Volume	53
Issue	3
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	তারেক রেজা
Published online	June 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i3.2
Pages	৩১-৫৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ফররুখ আহমদের কবিতা : সমকালীন প্রসঙ্গ

তারেক রেজা*

সার-সংক্ষেপ : সৃজনশীল ব্যক্তিপ্রতিভা কালের যাত্রার ধ্বনিকে স্বীকরণের মাধ্যমেই কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। জীবন ও শিল্পের সম্পর্ক স্রষ্টার বোধ ও ব্যক্তিত্বের ব্যাকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বকালের রূপ ও রস, সংঘর্ষ ও সম্ভাবনার স্বীকৃতিও শিল্পীর অন্তর্লোকের স্পর্শে অন্যরকম হয়ে ওঠে। ফররুখ আহমদের জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টি বিনির্মাণে বিশ শতকের চল্লিশের দশকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রভাব এই নিবন্ধে অনুধাবনের চেষ্টা করা হবে। যে ঐতিহ্যিক অনুবর্তন ফররুখের কবিতার গতি ও গভীরতার স্মারক, কবির স্বকালের সাপেক্ষে তার প্রাসঙ্গিকতা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কবির উদ্ভাবন ও উচ্চারণ কবিতার বিষয়ের সমান্তরালে শৈল্পিক সংহতি লাভ করেছে কি-না, এই নিবন্ধে তা-ও অন্বেষণের প্রয়াস থাকবে।

শিল্পসাহিত্যে সমসাময়িক প্রসঙ্গের অবতারণা বিষয়ে অনেক সমালোচকের আপত্তি প্রবল হলেও শেষ পর্যন্ত একজন শিল্পস্রষ্টাকে তাঁর স্বকালের কাঁধে ভর দিয়েই দাঁড়াতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে গিয়েও স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর 'দেশকালের প্রাণগত সম্মিলন আছে' বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ তাঁর মতে, স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর স্বকালের উদ্দেশ্যের পরিস্ফুটন ঘটে এবং সময়ের এই অভিপ্রায় সর্বদাই সুপ্রকাশিত নয়। (২০০৬ : ৪/৭৯২)। পৃথিবীর তাবৎ মহৎ শিল্পকর্মেরই এ এক সাধারণ কুললক্ষণ। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'শিল্পীর রচনা সাময়িক প্রসঙ্গকেই অবলম্বন করবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সাময়িক যেখানে দেশকাল অতিক্রম ক'রে চিরকালের পটভূমিকায় দীপ্যমান হ'য়ে ওঠে, সেখানেই আমরা শিল্পকলার মহত্তম পরিচয় পাই।' (১৯৫৯ : ২৫)। একজন প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টার কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণাও তাঁর স্বকালের পটভূমিতেই পরিস্ফুট বলে মনে করেন বুদ্ধদেব। তাঁর মতে, একজন লেখকের অন্যতম অবলম্বন তাঁর স্বদেশ ও স্বকাল –

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২

তাতে তিনি 'বিশ্বমানবের প্রাণস্পন্দন' অনুভব করেন। (বুদ্ধদেব বসু ১৯৫৯ : ২৯)। একজন কবিও সমাজের আর দশজন মানুষের মতো বিচিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ থেকেই কাব্যচর্চা করেন এবং সেই জীবনযাপনের নানা চিহ্নও তাঁর শিল্পকর্মে ছায়া ফেলে। যদিও 'সামাজিক হিসাবে কবির দায়িত্ব শুধু পরিবেশের প্রতিচ্ছবি অঙ্কনে কিংবা ঐতিহ্যের রূপায়ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের অমর অংশের জন্যে উপাদেয় উপজীবিকা সরবরাহ করাই বরং তার শ্রেষ্ঠ করণীয়।' (মনিরউদ্দীন ইউসুফ ১৯৮৮ : ৩৬৫)। ফররুখ আহমদের (১৯১৮-১৯৭৪) কবিতায়ও স্বকাল ও সমাজ সংলগ্নতার নানা চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং শিল্পসাধনা, সেই সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর মনোভাবের বিশেষত্ব চিহ্নায়নের প্রয়াসেও আমরা তাঁর কবিতার ওপরই নির্ভর করতে চাই।

ফররুখ আহমদ অস্থির-অশান্ত-অসংস্থিত স্বকাল থেকে মুক্তির জন্য বিশেষ ধর্মাদর্শে সমর্পিত হয়েছেন এবং এই আদর্শের অনুকূল আবহ সঞ্চারের শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজনে তিনি অতীত-ঐতিহ্যে অবগাহন করেছেন। 'ফররুখ আহমদ ঐতিহ্যে অবগাহন করেছিলেন সত্যি, কিন্তু সমকালীন সমাজ, বিশ্বপটভূমি এবং জাতীয় জীবনের ঐকান্তিক অনুভব তাঁর মধ্যে যুগপৎ স্পন্দমান থেকেছে। তাঁর এই ঐতিহ্যনির্ভরতা শুধু শেকড়সন্ধানী নয়, প্রকৃতি যুক্তির অঙ্গীকার অর্জনের নিবিড় অনুষঙ্গ।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০২ : ৮৭)। ফররুখ স্বকালের বৈনাশী বাস্তবতার নিয়ামকসমূহকে জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত করেছেন। যে কালখণ্ডে লেখকের নির্ভীক পদক্ষেপ, তারও সামান্য অংশেই তাঁর অধিকার জন্মে। 'অনেক দিগন্তে আজও হয় নাই শুরু পথ চলা,/কে জানে সকল কথা? কে পেয়েছে সংজ্ঞা সময়ের?' ('শেষ কথা'/*মুহূর্তের কবিতা*) – ফররুখের এই উচ্চারণে একজন শিল্পীর সীমাবদ্ধতা সুচিহ্নিত হলেও সময়কে নিবিড়ভাবে পাঠ করার অভিপ্রায়ও এতে মুদ্রিত। ইতিহাসের নিবিড় পাঠক ছিলেন তিনি। তাই ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ অনুভব করেছেন কবি। 'ইতিহাসের দীর্ঘ সড়কে তিনি বিচরণ করেছেন সজাগ মুসাফিরের মতো। উদ্ভ্রান্ত হন নি কখনো, বরং ঐতিহ্যের মূল স্রোতধারায় তিনি অবগাহন করে আপন সত্তাকে জাগ্রত করায় হয়েছেন ব্যাপৃত। ...দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কাল থেকে তাঁর লেখনী হিমাচলের দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। তাতে ঝঙ্কৃত হয়েছে আমাদের চেতনার মূল সুর। তা মুসলিম বাংলার মন ও মানসকে নবায়ন করার প্রেরণা জুগিয়েছে।' (হাসান আবদুল কাইয়ুম ১৯৮৮ : ৫৫৮)। ফররুখের রাজনীতি সচেতনতাও প্রকৃত অর্থে কবির সময় ও সমাজ-সম্পৃক্ততারই ফল। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে ফররুখ যে কাব্যাদর্শ সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাও কবির তীব্র স্বকাল-সংলগ্নতা এবং সমাজ-সম্পৃক্ততা থেকেই উৎসারিত। প্রসঙ্গত স্মরণ করি একজন সমালোচকের মন্তব্য :

> কবি ও রাজনীতিকের সমাজ-চর্চা এক নয়। সমাজ থেকে অবশ্য কবিকে বিচ্ছিন্ন হলেও চলে না। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কবির কবিতা কাগজের ফুল: প্রাণের সজীবতা তাতে অনুপস্থিত থাকে। রাজনীতিকের যে সমাজ-চর্চা পরিবেশের তাৎক্ষণিকতাকে অবলম্বন করে, কবি সেই সমাজের সংগে লগ্ন থাকার জন্যেই ঐতিহ্যকে ধরে থাকেন, তাই কবির ঐতিহ্যপ্রীতি জীবন-নিরপেক্ষ অতীতের কাহিনী-বিলাস নয়। জীবনের প্রয়োজনেই কবিকে ঐতিহ্য-সংলগ্ন হতে হয়। রাজনীতিকের সমাজ-চর্চা ও আশু কার্যসিদ্ধির সত্ত্বরতা, কিংবা ধর্মগুরুর বৃত্তাবদ্ধ নীতি নিয়মের চাপের কাছে আত্মসমর্পণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও, কবির কাছে তেমন কার্যসিদ্ধি তুচ্ছ ব্যাপার। (মনিরউদ্দীন ইউসুফ ১৯৮৮ : ৩৬৩-৬৪)

সাত সাগরের মাঝি ফররুখ আহমদের কালসচেতন ও সমাজসম্পৃক্ত কবিসত্তার শ্রেষ্ঠ ফসল। 'বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তামদ্দুনিক রূপকার দার্শনিক মহাকবি, আল্লামা ইকবালের অমর স্মৃতির উদ্দেশে' নিবেদিত এই কাব্যের শুরুতেই উৎসর্গপত্র হিসেবে একটি সনেট জুড়ে দিয়েছেন ফররুখ। এই কবিতায় তিনি আল্লামা ইকবালের দীপ্তিকে তুলনা করেছেন সিকান্দার শাহার সঙ্গে। 'নতুন পথের মোহে তৃপ্তিহীন তোমার অন্বেষা' – কবি ইকবালের উদ্দেশে ফররুখের এই উচ্চারণ থেকে এই কাব্যের মৌল সুরটি অনুধাবন করা যেতে পারে। ফররুখও নতুন পথের অন্বেষণেই অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এই নতুনের অন্বেষণে তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন বলেই পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতিও আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন, অতীতের প্রতি বিমুখ হলে বর্তমানের সঙ্গে সম্বন্ধ সুদৃঢ় হয় না এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করার শক্তিও অর্জিত হয় না। প্রসঙ্গত স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথের *কণিকা* কাব্যের 'চালক' শীর্ষক কবিতাটি :

> অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
> অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?
> সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি
> সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ৩/৭৫)

ফররুখ আহমদ আলোকিত আগামীর অন্বেষায় তাঁর 'পশ্চাতের আমি'র সঙ্গে সম্পর্কসেতু নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন। 'সাধারণভাবে মুসলমানদের নবজাগরণের জন্যে তিনি অতীত থেকে প্রেরণা লাভ করলেও বাস্তবে কিন্তু তিনি অতীতমুখী নন। অতীতের পুনরুজ্জীবন নয়, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পানে অভিযাত্রার স্বার্থে অতীতের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলো থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা গ্রহণই তাঁর কাম্য।' (আবদুল গফুর ১৯৮৮ : ৩৭৭)। আর এ-কাজে অন্যতম প্রেরণাসঞ্চারক চরিত্র হিসেবে আরব্য-উপন্যাসের নায়ক সিন্দাবাদের সাহচর্য দারুণভাবে উপভোগ করেছেন কবি। ফররুখ তাঁর আপন চৈতন্যের সারাৎসারকে সিন্দাবাদের রূপকল্পে উপস্থাপন করেছেন।

"সিন্দাবাদ বীর, সাহসী, সংগ্রামী, অকুতোভয় যোদ্ধা নেতৃত্বের প্রতীক। উপমহাদেশের মুসলিমদের নৈরাশ্য-ধূসর জীবন থেকে উদ্ধারের জন্য যে সাহসী নেতার প্রয়োজন ছিল 'সিন্দাবাদ'-এ তারই স্বরূপ রূপায়িত করা হয়েছে। আরব্য রজনী থেকে ফররুখ এই বীর নায়কের নির্বাচন করেন।" (শাহাবুদ্দীন আহমদ ২০০২ : ১৭৮)। সিন্দাবাদের দুঃসাহসী অভিযানকে তিনি স্বকালের বৈরী বাস্তবতার মুখোমুখী দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করি :

> উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ লোনা দরিয়াসম বৈরী পরিবেশের সকল বিপত্তির কালো রাত পাড়ি দিয়ে এ নাবিক যাত্রা শুরু করেছিলেন 'হেরার রাজতোরণ'-এর উদ্দেশ্যে। দূরবিস্তারী লোনা দরিয়ারি হু হু বাতাসে আমাদের কানে ভেসে আসছিল সে নাবিকের অসহিষ্ণু আর্তনাদ -- 'রাত পোহাবার কত দেরী, পাঞ্জেরী?' বলা বাহুল্য, আমাদের স্বপ্নরাজ্যের সে নতুন দুঃসাহসী সিন্দাবাদ ছিলেন এ যুগের ব্যতিক্রমী কবিকণ্ঠ ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। (মুহিউদ্দীন খান ১৯৮৮ : ১৭৮)

যে সিন্দাবাদকে আমরা ফররুখ আহমদের কবিতায় উপস্থিত হতে দেখি, সে সিন্দাবাদ অতীতের সকল শক্তি ও সমৃদ্ধিসমেত নতুন অবয়বে নির্মিত। সিন্দাবাদের হাতে আমরা যে আলোর মশাল দেখতে পাই, তা বর্তমানের কালো রাত্রি ভেদ করে একালের বিভ্রান্ত পথিককে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেবে – এই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন লক্ষ করি ফররুখের কবিতায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. ভেঙে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ,
ছিঁড়ে ফেলো আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দবাদ! ('সিন্দবাদ')

খ. নিপুণ হাতের বলিষ্ঠ পেশী যদি প'ড়ে যায় ছিঁড়ে
তবে দুরন্ত বদলায়ে নাও হাত,
এক লহ্‌মার গাফলতে জেনো এই মৃত্যুর তীরে
ডোবালে অতলে প্রবল ঝঞ্ঝাঘাত।
বল্‌গা টানো এ ফেনিলাবর্তে
পার হয়ে এই ঝড়
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘুরে পথ খুঁজে পাবে তাজী! ('বা'র দরিয়ায়')

গ. কালো মওতের মুখোমুখি হ'য়ে জংগী জোয়ারে ফিরে
দরিয়া-সোঁতায় টেনে তুলি চলো তুফানের মাতামাতি।
ভুলে যেও না এ মাল্লার জিন্দিগী,
শুরু করো ফের নতুন সফর আজি,

দেখ, মাস্তুলে জ্বেলেছি নতুন বাতি;
মৌসুমী-হাওয়া পাল ভ'রে ওঠে বাজি। ('দরিয়ায় শেষ রাত্রি')

উদ্ধৃতিসমূহে আমরা বৈরী বাস্তবতার বিবরণ লক্ষ করি এবং সিন্দাবাদের সাহসী কর্মকাণ্ডের শরণ নিয়ে তা থেকে উত্তরণের প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন কবি। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সিন্দাবাদকে কবি নতুন দিনের স্বপ্ন জাগানিয়া হিসেবে নির্মাণ করেছেন। আকাশের নতুন চাঁদ, দরিয়ার দামাল জোয়ার এবং নতুন পানি কবির ইতিবাচক জীবনার্থে সমর্পিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। উদ্ধৃতি খ-এর মর্মকথাও পরিবর্তিত জীবনব্যবস্থার রূপায়ণ। এখানে কবি যে মৃত্যু-উপত্যকার কথা বলেছেন, তা কেবল কবির স্বকালের সাধারণ মানুষের মৃত্যুই নয়, মনুষ্যত্বের মৃত্যুরও স্মারক। তাই বাধা অতিক্রম করে কবি দরিয়ার তাজীকে গন্তব্যে পৌঁছানোর তাগিদ দিয়েছেন। গ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতেও 'কালো মওতের মুখোমুখি' দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে। অন্ধকার ভেদ করে আলোর দিগন্তে পৌঁছানোর প্রত্যাশাই এখানে নতুন সফর ও নতুন বাতির রূপকল্পে উদ্ভাসিত। মৌসুমী হাওয়ায় পাল ভরে ওঠার কথা ব্যক্ত করেছেন কবি। এই হাওয়াও আমাদের নতুনের কেতন ওড়ানোর কথা মনে করিয়ে দেয়।

ফররুখের কবিস্বভাবের অনুকূল আবহ সঞ্চারে সিন্দাবাদ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। সহজ স্বাভাবিক ঝঞ্ঝামুক্ত জীবনযাপনের মধ্যে যে আপসকামী মনোভাবের প্রকাশ থাকে, ফররুখের জীবন ও কর্মে তা যেমন অনুপস্থিত, তেমনি তাঁর কাব্যসাধনায়ও তিনি এক দুঃসাহসী কবিব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁর শিল্পকর্মে সিন্দাবাদ ঘুরেফিরে এসেছে। হাতেম তা'য়ীকে নিয়ে একাধিক কাব্যই শুধু রচনা করেন নি, তাঁর অন্যান্য কবিতায়ও তিনি বারবার হাতেমের শরণ নিয়েছেন। এই দুই চরিত্রের দুঃসাহসী অভিযানের প্রতি ফররুখের মুগ্ধতা থেকে আমরা তাঁর কবিস্বভাবের ধরনটিও অনুধাবন করতে পারি। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যাক :

> বিশ্বসাহিত্যের অন্য একটি চারিত্রলক্ষণ ফররুখ-কাব্যে প্রতিভাসিত। তা হচ্ছে এ্যাডভেঞ্চার, একটা যাত্রা, অভিযাত্রা, ভ্রমণ। ফররুখ আহমদের প্রথম ও শেষ নায়ক, সিন্দাবাদ ও হাতেম তা'য়ী, দুজনই অভিযাত্রিক। এই-যে বৃহৎ কল্পনা, অভিযাত্রা, এরই মধ্যে ফররুখের রোমান্টিকতা ও আদর্শিকতার এক আশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছে। বৃহতের জন্যে এরকম তৃষ্ণা তিরিশ-পরবর্তী কবিতায় দুর্লভ। এই দুর্লভতাই কবি হিশেবে ফররুখ আহমদের মহত্ত্বকে চিনিয়ে দ্যায়। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৫ : একত্রিশ)

ফররুখ আহমদের *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যে বিপর্যস্ত বর্তমানের বিরুদ্ধে কেবল সংগ্রামের কথাই ব্যক্ত হয় নি, সংগ্রাম-উত্তর শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রত্যাশাও সেখানে প্রতিভাত। জীবনের সজীবতা ও সচলতা তাঁর কবিতায় সফর হিসেবে চিত্রিত

হয়েছে। জীবন তাঁর কবিতায় নদী নয়, বরং বিক্ষুব্ধ দরিয়ার রূপকে ধরা পড়েছে। গন্তব্যের প্রত্যাশাকে কবি বন্দর ও নিশানের রূপকল্পে নির্মাণ করার প্রয়াস দেখিয়েছেন। তাঁর কবিতায় বন্দর ও নিশানের উপর্যুপরি ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তিনি বিশ্বাস করেন, গন্তব্য নির্দিষ্ট না হলে পথিকের পথচলায় আনন্দ থাকে না। তাঁর মতে, মানুষের জীবনে যে হাহাকার ও অশান্তির কালো ছায়া নেমে এসেছে, তার কারণ মানুষ গন্তব্যে পৌঁছানোর সঠিক নির্দেশনা অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে কবির এই অনুভবের স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে :

ক. কেটেছে রঙিন মখমল দিন ওজুদে চিক্‌না সরে,
তবু সফরের ঢেউ ভেসে এল বন্দরে, ('সিন্দবাদ')

খ. এবার কোথায় কোন্ বন্দরে মাঝি!
ভিড়বে কিশ্‌তী মুখ?
থামবে কোথায় দরিয়ার শাদা তাজী? ('বা'র দরিয়ায়')

গ. পার হয়ে কত এসেছি নিরালা দরিয়ার বিভীষিকা
মাস্তুলে ফিরে জ্বালায়েছি দেখ সফরের শিখা... ('দরিয়ায় শেষ রাত্রি')

ঘ. ষোল পাপড়িতে ঘেরা ষোড়শীর সে পূর্ণ যৌবনে
আসিল অতিথি এক বন্দরের শ্রান্ত মুসাফির! ('বন্দরে সন্ধ্যা')

ঙ. হে নিশান-বাহী! আজো সম্মুখে রাতের সীমা,
দৃষ্টি রোধে কি তিমিরাচলের ঘন গ্লানিমা? ('হে নিশান-বাহী!')

চ. নিশান আমার! নিশান আমার!
এতদিনে হ'ল সময় তবে? ('নিশান')

ছ. এখানে তোমার নিশান ওড়াও, নিশান ওড়াও বীর,
এখানে শুধুই আবছায়া রাত্রির ('নিশান-বরদার')

জ. কোন্ অজ্ঞাত বন্দরে এসে লাগলো সেই জাহাজ
মনে পড়ে নাকো আজ, ('সাত সাগরের মাঝি')

উদ্ধৃতিসমূহে ফররুখ আহমদ বিপন্ন বর্তমানের বিরুদ্ধে লড়াই করে সমৃদ্ধ ও আলোকিত আগামী নির্মাণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। বর্তমানের বৈরী বাস্তবতার স্বরূপ অনুধাবনের সহায়কশক্তি হিসেবে তাঁর কবিতায় অতীতের নানা অনুষঙ্গের ব্যবহার লক্ষ করার মতো। তাঁর কবিতার সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হলেও মাঝি-মাল্লাদের চোখে থাকে অনুপম স্বপ্ন এবং বুকে থাকে অন্তহীন সাহস। তাই তারা নিশানের দিকে দৃষ্টি রেখে বন্দরে নোঙর করতে চায়। মাঝির উদ্দেশ্যে কবি বলেন, অশুভ শক্তি 'বিষাক্ত ক'রছে তোমার নুয়ে পড়া আকাশেরে', তবু তাঁর সাত সাগরের মাঝির 'কপাটে মানুষের হাহাকার' এবং 'ক্ষুধিত শিশুর কান্না' এসে আছড়ে পড়ে। কবির বিশ্বাস, এই দুঃসময়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেই তাঁর মাঝি বন্দরে পৌঁছে যাবে।

ফররুখ আহমদ *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় স্বকালের অন্ধকারকে অতীতের উজ্জ্বল দিনের সাপেক্ষে উপস্থাপন করেছেন। তাই তাঁর কবিতায় সেকালের মধ্যাহ্ন সূর্যের পাশাপাশি একালের অস্তগামী সূর্যের রূপকল্প নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। অস্তগামী সূর্যই কেবল নয়, সূর্যহীন অবস্থা, অর্থাৎ অন্ধকার, কালো কিংবা রাত্রির প্রসঙ্গও তাঁর কবিতায় বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীর সংলগ্নতা থেকে তিনি স্বকালকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লাভ করেছেন। ফররুখের কবিতায় একালের দুঃসহ দিন-রাত্রির অভিজ্ঞতা সেকালের উজ্জ্বল দিনের সাপেক্ষে উপস্থাপিত হয়েছে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

ক. দিনের আকাশে এ কি জুলমাত মাঝি?
ঐ দেখ আসে মউজের পর মউজের কালো সারি; ('বা'র দরিয়ায়')

খ. দেখছো কেবল তৃষ্ণায় ভরা কালো রাত্রির বিষ –
সূর্যোদয়ের পথে দেখ নাই মিঠে পানি; ওয়েসিস।
ডুবে গেছে চাঁদ? আঁধারে যায় না দেখা? ('আকাশ-নাবিক')

গ. এই সব রাত্রি শুধু একমনে কথা কহিবার –
খরস্রোতা জীবনের কোল ঘেঁষে যেখানে অসাড়
অন্ধকার বালিয়াড়ি, তলদেশে যাত্রীরা নিশ্চল,
মৃত্যুর কুয়াশা মাঝে বিবর্ণ তুহিন তনুতল ('এই সব রাত্রি')

ঘ. আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী,
মোদের খেলায় ধূলায় লুটায়ে পড়ি'
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী। ('পাঞ্জেরী')

ঙ, সূর্য আজ ডুব দিল অস্ত্রাসের তটরেখা পারে
আসন্ন সন্ধ্যার কালি নিয়ে এল পুঞ্জীভূত শোক,
পাহাড় ভুলের বোঝা রুদ্ধপথে দাঁড়ালো নির্মম। ('স্বর্ণ-ঈগল')

চ. হে নিশান-বাহী! ওড়াও তবুও ওড়াও
হেলাল রশ্মি আকাশে আকাশে ছড়াও। ('হে নিশান-বাহী')

ছ. কার হাতে তুমি সওয়ার হ'য়েছ আল হেলাল?
আরাফাত মাঠে প'ড়ে আছে ম্লান নাই বেলাল! ('নিশান')

জ. উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির আজো মেটেনি কি সব দেনা?
সকাল হ'য়েছে : তবু জাগলে না? ('সাত সাগরের মাঝি')

সাত সাগরের মাঝি কাব্যে ফররুখ আহমদ সমসাময়িক অস্বস্তি ও অস্থিরতাকে কেবল অতীত ও ঐতিহ্যের আলোকেই উপস্থাপন করেন নি, কোন কোন কবিতায় সরাসরি

বর্তমানকেই অবলম্বন করেছেন তিনি। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে প্রগতি-কবিতার যে ধারা বহমান ছিল, ফররুখের কয়েকটি কবিতাকে সেই ধারার সমান্তরালে পাঠ করা যায়। যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ তাঁর কবিতার প্রধান অবলম্বন, এই কবিতাগুলোতেও তার প্রতিধ্বনি অনুপস্থিত নয়। বিশৃঙ্খল বর্তমানের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো এবং স্বকালের অসুখ ও অস্থিতিশীলতার জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হওয়ায় কবিতাগুলো লাভ করেছে ভিন্ন মাত্রা। এই কাব্যের 'লাশ' এবং 'আউলাদ' শীর্ষক কবিতা দুটোকে আমরা এ-জাতীয় কবিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। "আউলাদ' ও 'লাশ' ইত্যাদি কবিতায় মানবতার বিপর্যয়ের জন্যে হাহাকার এবং ক্ষুধাতুর মানুষের জন্যে বেদনা প্রকাশ পেয়েছে, বলিষ্ঠ ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে মানবতাবিরোধী শোষক-সমাজ ও সভ্যতার প্রতি অভিশাপ।" (মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ ১৯৮৮ : ৪৬৫)। এই কবিতাদ্বয়ে ভোগবাদী মানুষের পাশবিক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন কবি।

ফররুখের 'লাশ' কবিতাটি ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত। তাঁর স্বকালের সকল কবিকেই তেরশ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং সেই সময়ের প্রত্যেকের কবিতায়ই আমরা এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এবং এর কারণ চিহ্নিতকরণের প্রয়াস লক্ষ করি। 'বাঙালি কবি সাহিত্যিকেরা দুর্ভিক্ষের কারণ ও লক্ষণের মধ্যে প্রভেদটা বুঝেছিলেন ভালো করেই। সেই বোধ কমবেশি প্রকাশ পেয়েছে এঁদের সৃষ্টিতে। সরকারের প্রতি এঁরা ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, মজুতদারদের প্রতি ঘৃণা। জেনেছেন, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়েছে মানবতা। কিন্তু এও তাঁরা দেখেছেন যে, মনুষ্যত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বারেবারেই। ভাবতে চেষ্টা করেছেন শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে মানবতাই।' (স্বপন সেনগুপ্ত ২০০৪ : ১০৮)। মানতার বিজয়ে বিশ্বাসী হয়ে কেবল চিহ্নায়নে মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি তাঁরা, কেউ কেউ এই মানবসৃষ্ট দুর্যোগের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলারও আহ্বান জানিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩) এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-১৯৪৭) কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৯৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০), দিনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), মনীন্দ্র রায় (১৯১৯-২০০৩) প্রমুখ কবিও এই মন্বন্তরকে কবিতায় ধারণ করেছেন। 'মন্বন্তরকালীন পরিস্থিতি ও মানুষজনের দুঃখ-দুর্দশায় অভিভূত কবিকুলের হৃদয়বেদনা এ-সমস্ত কবিতায় উদ্ঘাটিত।' (বিনতা রায়চৌধুরী ১৯৯৭ : ১৮০-৮১)। বাংলাদেশের কবিতায়ও আমরা দুর্ভিক্ষের দুঃসহ দিনগুলোর রূপায়ণ লক্ষ করি। আহসান হাবীব এই বিপর্যয়কে কবিতায় ধারণ করেছেন। অন্ন-বস্ত্রহীন মানুষের জীবনরক্ষার লড়াইকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন তিনি। বন্দে আলী মিয়া (১৯০৮-১৯৭৯), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২), আবুল হোসেন (জ.

১৯২২), মতিউল ইসলাম (১৯১৮-) প্রমুখ কবির সৃজনকর্মেও এই বিপর্যয়ের সংহত উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। ফররুখ আহমদের 'লাশ' এ-ধারারই একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। 'বস্তুতঃপক্ষে তের শ' পঞ্চাশ ফররুখকে মানুষ সম্বন্ধে শুধু নতুন ধারণাই দেয়নি, মানুষের সভ্যতার গুণাগুণ পরিমাপ করার নতুন চোখও দিয়েছিল। ইতিহাস পড়লে বা জানলে মোটামুটি আঁচ করা যায় যে তের শ' পঞ্চাশের কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, বিদেশী শাসন এবং পরাধীনতাজনিত কারণে মানুষের মানবিক চেতনার সুপ্তিমগ্নতা।' (শাহাবুদ্দীন আহমদ ২০০২ : ১০৮-১০৯)। ফররুখ এই কবিতায় মন্বন্তরের ভয়াবহতাই কেবল নির্দেশ করেননি, সেই সঙ্গে দায়ী ব্যক্তিদের মুখোশ উন্মোচনেরও প্রয়াস পেয়েছেন। মানুষ-রূপী শয়তানদের কলুষিত আত্মার নোংরামি আর নষ্টামির চিত্র তিনি এই কবিতায় ধারণ করেছেন। ফররুখের 'লাশ' কবিতাটি থেকে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক অংশ উপস্থাপন করছি :

ক. জানি মানুষের লাশ মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে ধরণীর 'পর,
ক্ষুধিত অসাড় তনু বত্রিশ নাড়ীর তাপে প'ড়ে আছে
নিসাড় নিথর,
পাশ দিয়ে চ'লে যায় সজ্জিত পিশাচ, নারী নর ('লাশ')

খ. পৈশাচিক লোভ
করিছে বিলোপ
শাশ্বত মানব-সত্তা, মানুষের প্রাপ্য অধিকার,
ক্ষুধিত মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় রুধিয়া দুয়ার,
মানুষের হাড় দিয়ে তারা আজ গড়ে খেলাঘর;
সাক্ষ্য তার প'ড়ে আছে মুখ গুঁজে ধরণীর 'পর। ('লাশ')

গ. কার হাত অনায়াসে শিশু কণ্ঠে হেনে যায় ছুরি?
কোন্ সভ্যতার?
পাঁজরার হাড় কেটে নৃত্য সুর জেগে ওঠে কার?
শ্রমিকের রক্তপাতে পান-পাত্র রেঙে ওঠে কার?
কোন্ সভ্যতার?
মানুষ তোমার হাতে করিয়াছে কবে আত্মদান,
তারি শোধ তুলে নাও হে জড়-সভ্যতা শয়তান!
শিশুর শোণিত হেসে অনায়াসে করিতেছে পান,
ধর্ষিতা নারীর দেহে অত্যাচার করিছ অম্লান,
জন্তান সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বে উঠি অতি অনায়াসে
তারে তুমি ফেলে যাও পথ-প্রান্তে নর্দমার পাশে। ('লাশ')

ঘ. হে জড় সভ্যতা!
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতোদর শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;

তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি;
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও :
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও ॥ ('লাশ')

ফররুখ আহমদ দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রের অদূরদর্শিতা, অবহেলা ও অবজ্ঞার চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থসর্বস্ব, ভোগবাদী মানুষ এবং সমাজ-সভ্যতাকে দায়ী করেছেন। এই কবিতায় মুদ্রিত সভ্যতা তাঁর কাছে 'স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা', জড়পিণ্ড নিঃস্ব সভ্যতা, 'জড়-সভ্যতা', 'মৃত-সভ্যতা' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ফররুখের 'লাশ' কবিতা-বিষয়ে একজন সমালোচকের মন্তব্যের শরণ নেওয়া যেতে পারে :

> ফররুখ আহমদ তাঁর 'লাশ' কবিতায় শুধু দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষের অসহায় করুণ অবস্থার 'ফটোগ্রাফিক' চিত্র রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাঁর আন্তরিক আবেগ অনুভূতি ও চেতনা দিয়ে মানবতার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। তাঁর কবিতায় ঘৃণা ও ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে জড়সভ্যতা এবং পুঁজিবাদী শোষক সমাজের বিরুদ্ধে। তিনি আগামী দিনের অর্থাৎ নির্যাতিত নিপীড়িত ও বুভুক্ষু মানুষের উত্থান এবং অগ্রযাত্রার দিনে, এই জড়সভ্যতা ও পুঁজিবাদ শোষক সমাজকে 'জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে' টেনে নিয়ে যাবার কথাও দৃঢ় ও বলিষ্ঠকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। (মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ ১৯৭৮ : ২২৯)

ফররুখ আহমদের 'আউলাদ' শীর্ষক কবিতাটিতেও আমরা 'এ বীভৎস সভ্যতার' চিত্রায়ণ লক্ষ করি। 'লাশ' শীর্ষক কবিতায় বিম্বিত নর-পিশাচদের হীন প্রবৃত্তির প্রকট রূপটিই মুদ্রিত হয়েছে, যা দুর্ভিক্ষের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে উৎসারিত। কবিতাটির প্রথম দুইটি স্তবকে দুর্যোগের ভয়াল কালো রাত্রি অতিক্রম করার প্রত্যাশা উচ্চকিত এবং এই উত্তরণের প্রেরণা-সঞ্চারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি 'বিজয়ী সিন্দবাদ'কে ফিরিয়ে এনেছেন। তারপর সিন্দাবাদের চোখে তিনি তুলে ধরেছেন 'দুর্গম সমুদ্র পারে আরেক অচেনা লোক', যেখানে মানুষের ঘর মানেই জীবন্ত কবর, 'যেখানে বাসা বেঁধে আছে দাম্ভিকের মৃত মরু মন'। আশাবাদী কবি তবু মানুষকে গাঁইতি, শাবল, কলম, লাঙল নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে দেখেন যারা 'পার হ'য়ে মরু, মাঠ, বন' পৌঁছে যায় 'মানুষের আদালত ঘরে', কারণ সেই ঘরে কবি লক্ষ করেছেন 'পাথর-জমানো প্রহসন'। এই কবিতার পরের অংশকে অনায়াসে 'লাশ' কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা যায়। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে :

ক. দল বেঁধে চলিছে শিশুরা মড়কের পথে,
কুৎসিত কুটিল কালো অন্ধকার শড়কে বিপথে
যেখানে প্রত্যেক প্রান্তে আজাজিল পাতিয়াছে ফাঁদ
তারি পানে, দুর্নিবার টানে চলে আজ মানুষের
দুর্বল, বিশীর্ণ আউলাদ।
আমি দেখি পথের দু'ধারে ক্ষুধিত শিশুর শব,
আমি দেখি পাশে পাশে উপচিয়া পড়ে যায়
ধনিকের গর্বিত আসব,
আমি দেখি কৃষাণের দুয়ারে দুর্ভিক্ষ বিভীষিকা,
আমি দেখি লাঞ্ছিতের ললাটে জ্বলিছে শুধু অপমান টিকা,
গর্বিতের পরিহাসে মানুষ হ'য়েছে দাস,
নারী হ'ল লুণ্ঠিতা গণিকা। ('আউলাদ')

খ. বাড়ায়ে ত্রস্তের দল, বাড়াবে ভ্রষ্টের দল,
নর-ঘাতকের সাথে, নারী-ঘাতকের হাতে
হ'ল এরা শোণিত-চঞ্চল
হ'ল এরা জালিম, নিষাদ,
মানুষের অমানুষ মৃত আউলাদ। ('আউলাদ')

গ. অনেক সভ্যতা জানি মিশেছে ধূলির নীচে, অনেক সামুদ
কত ফেরাউন, কত জালিম পিশাচ নমরুদ
মিশে গেল ধূলিতলে
নতুন যাত্রীর দল দেখা দিল দুর্গম উপলে
উড়ায়ে নিশান
সাথে ক'রে নিয়ে এল জীবনের অ-শ্রান্ত তুফান। ('আউলাদ')

ফররুখ আহমদের কালসচেতনতা এবং সমাজসংলগ্নতার স্বাক্ষর তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও দুর্লক্ষ্য নয়। বলা যেতে পারে, *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যের ফররুখ আহমদই ভিন্ন অবয়ব ও আয়োজনে তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে উপস্থিত। তিনি যখন ইসলামি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্বর্ণোজ্জ্বল পৃষ্ঠাগুলো পাঠ করেছেন, তখন তিনি সেই কালের আলোকিত দৃশ্যাবলির সঙ্গে একালের সামাজিক-রাজনৈতিক অসুস্থতা ও অস্থিরতার চিত্রাবলি জুড়ে দিয়েছেন। ফররুখের 'সিন্দবাদ' কবিতার সমসময়ে রচিত *সিরাজাম মুনীরা* কাব্যের কবিতাবলির জন্মলগ্নের দৈশিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং এ-কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একজন সমালোচকের অভিমত :

> এ-সময়ে বিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। উপমহাদেশে চলছিল বৃটিশ প্রশাসন থেকে মুক্তির আন্দোলন এবং ইসলামী ঐতিহ্য সংস্কৃতি রক্ষার জন্য ও উপমহাদেশের

> মুসলিমদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পাকিস্তান আন্দোলন। সুতরাং বলা যেতে পারে মানবতার জন্যে, নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্যে এবং কোনঠাসা উপমহাদেশের মুসলিমদের পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তির সংগ্রামই ছিল 'সিন্দাবাদ' ও 'সিরাজাম মুনীরা'র বিষয়বস্তু। (শাহাবুদ্দীন আহমদ ২০০২ : ১৭৮)

সিরাজুম মুনীরা কাব্যে আমরা লক্ষ করি, মুহম্মদের জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত 'সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা' কবিতায় তিনি মুহম্মদকে সিরাজাম মুনিরা বা আলোর চেরাগ সম্বোধন করে সেকালের আলোয় একালের অন্ধকার দূর করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। একইভাবে 'খোলাফায়ে রাশেদীন' অংশের খলিফাবৃন্দের জীবনচরিত অবলম্বনে রচিত কবিতায় তিনি বর্তমানের নানা প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন। এ-গ্রন্থের অন্যান্য কবিতায়ও 'আমরা কবির এই প্রবণতা লক্ষ করব। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ক. তোমার পথের প্রতি বালুকায় এখনো উদার আমন্ত্রণ,
ঘাসের শিয়রে সবুজের ছোপ জাগায়ে স্বপ্ন দেখিছে বন।
('সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা')

খ. পার হ'য়ে তুমি এসেছো অনেক ঝড়,
পাড়ি দিয়ে তুমি এসেছো অনেক মরু,
তাই সমুদ্র-বাধা প'ড়ে আছে পোষ মানা সরোবর
যে বিরাণ মাঠে জেগেছে একেলা
সেই মাঠে আজ জাগে অসংখ্য তরু। ('আবুবকর সিদ্দিক')

গ. আজকে এখানে নিশীথ-প্রহরী উমর জাগে না আর।
তবু অতীতের প্রশ্বাসে আজো ভরে নিখিল,
দরদী উমর! বন্ধু উমর, দারাজ দিল ॥ ('উমর-দারাজ দিল')

ঘ. আজ জাগবার–আজ জাগবার দিন,
মৃত্যু যেখানে তুলিয়াছে সংগিন
নিজেকে সেখানে সবল করিয়া দিতে হবে শেষ দান ('আজ সংগ্রাম')

ঙ. মনের সকল পশুদল আজ
মাতাল–টেনেছে সুরা,
মধ্যদিনের আকাশ আমার
হ'য়েছে তন্দ্রাতুরা,
ঝিমন্ত; নির্জীব।
রণশ্রান্ত সে দেখে পূর্ণ পাশবিকতা,
মাথা কোটে তার অন্তিম ব্যর্থতা! ('এই সংগ্রাম')

উদ্বৃতিসমূহে কবির সময় ও সমাজভাবনার স্বাক্ষর স্পষ্ট। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শরণ নিলেও কবি শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বকালের সমাজবাস্তবতায় এসে নোঙর করেছেন এবং

বিপন্ন জীবন ও বিধ্বস্ত মূল্যবোধের জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ যথার্থই বলেছেন, এ-কাব্যে 'প্রকাশ পেয়েছে মানবতাবাদী আদর্শের উজ্জীবন ও প্রতীক্ষার প্রত্যাশা। চরিত্রবান, সেবাব্রতী ও কর্মী মানুষের দিকে এই প্রত্যাশাতেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে।' (১৯৮৮ : ৪৬৫)। কবির এই প্রসারিত দৃষ্টি গভীরভাবে স্বকালসংলগ্ন বলেই তাঁর কবিতায় প্রতি যুগের মর্মের স্পন্দন অনুভূত হয়।

মুহূর্তের কবিতা ফররুখ আহমদের সনেট-সংকলন। ফলে এতে গীতিকবিতার বিচিত্র অনুষঙ্গের সম্মিলন লক্ষ করা যাবে। ফররুখের সনেটে তাঁর রোমান্টিক চিত্তবৃত্তির বিকাশও ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শের আবহে উপস্থাপিত। তবু এতে ধরা পড়েছে কবির স্বকালের সমাজজীবন এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার নানা চিহ্ন। ফররুখ-গবেষক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে :

> কবি এখানে বর্তমানের রূঢ়তার মধ্যে, জটিলতার মধ্যে অনেকটাই জেগে উঠেছেন, পারিপার্শ্বে দৃষ্টি তুলে ধরেছেন, আপন হৃদয়-গহীনে ডুব দিয়ে ভাবনার মুক্তা আহরণের চেষ্টা পেয়েছেন। এ কাব্যে তিনি বিশুদ্ধ হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, আপন পারিপার্শ্ব সম্পর্কে সুতীব্র চেতনার পরিচয় দিয়েছেন, যুগ ও জীবন, স্বদেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনার চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। (২০০৮ : ১৪৪)

কালসচেতনতা ফররুখের কবিতার একটি সাধারণ কুললক্ষণ হলেও *মুহূর্তের কবিতা*র কালসচেতনতাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়। কাব্যের নামকরণের মধ্যেই সময়ের পরিসর বিষয়ে তাঁর অভিমত উপস্থিত। এ-কাব্যের প্রথম তিনটি কবিতার নামকরণেও – 'মুহূর্তের কবিতা', 'মুহূর্তের গান' এবং 'দুর্লভ মুহূর্ত' – কবি অনন্ত কালপরিসর থেকে ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামান্য কালখণ্ডে মনোযোগ দিয়েছেন। 'ক্ষণিকের চিন্তা ক্ষণিকের ভাবনা কবি-চেতনাকে মুহূর্তের জন্য নাড়া দিলেও কবি সেগুলিকে মূল্যহীন মনে করেননি বরং কবিতার ভাষায় চিরস্থায়ী করে গেছেন।' (গোলাম মঈনউদ্দিন ১৯৮৫ : ৭৭)। প্রথম কবিতায় ফররুখ সময়কে শাশ্বত ও স্থির হিসেবে চিহ্নিত করে মুহূর্তের গতিময়তায় মগ্ন হয়েছেন এবং এই গতি পাখির গানে, সমুদ্রের স্রোতে ও সফেদ-জরদ-নীল বর্ণালির আভায় ধরা পড়েছে। অন্য দুটি কবিতায়ও মুহূর্তের প্রতিধ্বনি মুদ্রিত। তিনটি কবিতা থেকেই প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি :

ক. মুহূর্তের এ কবিতা, মুহূর্তের এই কলতান
হয়তো পাবে না কণ্ঠে পরিপূর্ণ সে সুর সম্ভার,
হয়তো পাবে না খুঁজে সাফল্যের, পথের সন্ধান,–
সামান্য সঞ্চয় নিয়ে যে চেয়েছে সমুদ্রের পার;

তবু মনে রেখো তুমি এ নগণ্য এ ক্ষণিকের গান
মিনারের স্তম্ভ ছেড়ে মূল্য চায় ধূলি কণিকার ॥ ('মুহূর্তের কবিতা')

খ. ভোলো যুগান্তের কথা, ভুলে যাও দীর্ঘ শতাব্দীর
খতিয়ান, কাম্য এ মুহূর্ত শুধু, মুহূর্তের গান
আকাশের রঙ নিয়ে দুই চোখে জাগুক অম্লান,
ঘাসের সবুজ শীষে জমে ওঠে যেমন শিশির। ('মুহূর্তের গান')

গ. এমন মুহূর্ত আসে এ জীবনে (হয়তো ক্বচিৎ
সে মুহূর্ত, তবু আসে, তবু ফিরে আসে)
যখন বিক্ষত মন ব্যথা কিম্বা বিষণ্ন সন্ত্রাসে
পড়িতে চাহে না বাধা, ফিরে পেতে চায় না সম্বিৎ? ('দুর্লভ মুহূর্ত')

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে ফররুখের কাব্যভাবনার প্রকাশ স্পষ্ট এবং শিল্পসাহিত্যে কালের কণ্ঠস্বর কীভাবে বিশেষ মুদ্রায় উপস্থাপিত হয়, তার একটা রূপরেখা প্রণয়নের চেষ্টা এতে চোখে পড়ে। যে-সকল সনেটে কবির জীবনদর্শনের ছায়াপাত ঘটেছে, সেখানেও আমরা তাঁর যুগসচেতন শিল্পসত্তার পরিচয় পাই। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৮ : ১৪৩) এই গ্রন্থের 'সাতান্ন'র কবিতা/এক', 'সাতান্ন'র কবিতা/দুই', 'শহীদ-স্মরণে', 'পূর্বসূরীর প্রতি', 'কর্মীর প্রতি', 'কবির প্রতি', 'পূর্ণিমা', 'এই বিধ্বস্ত শহর', 'একটি আধুনিক শহর', 'রক পাখী', 'অশান্ত পৃথিবী', 'হিংস্র, ক্ষুধাতুর রাত্রি', 'মুক্তিস্বপ্ন' প্রভৃতি কবিতায় ফররুখের যুগ ও জীবনভাবনার প্রকাশ ঘটেছে বলে উল্লেখ করেছেন। মানবজীবন মুহূর্তের সংস্থিতিতেই একটি অবয়ব ধারণ করে এবং বিশাল কালখণ্ডের সাপেক্ষে জীবনের পরিসর এত সীমিত যে অনিঃশেষ অধরার অনুভব ও উপলব্ধির জন্য মানুষের আক্ষেপের সীমা নেই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি :

ক. একশো বছর আগে; তবু আজো আছে অমলিন
সেদিনের স্মৃতি-গাঁথা শহীদের লাল রক্তে আঁকা;
রক্ত-ঝড়ে-ঘূর্ণাবর্তে সেদিনের জেহাদী পতাকা
জেগে আছে বুকে নিয়ে জালিমের কৌশলী সঙ্গিন।
('সাতান্ন'র কবিতা/এক')

খ. একশো বছর পরে জাগে প্রাণ সে রক্ত প্রবাহে,
কীটদষ্ট পিতৃভূমি জাগে আজ তীব্রতর দাহে ('সাতান্ন'র কবিতা/দুই')

গ. আমরা এসেছি পথে, জীবনের সুদৃঢ় সড়কে
যেখানে প্রতিটি ইঁটে সুকঠিন তোমার প্রয়াস,
প্রতি পাথরের মূলে যেখানে তোমার তপ্ত শ্বাস
রক্তক্ষরা স্বেদবিন্দু ভেসে ওঠে চোখের পলকে। ('পূর্বসূরীর প্রতি')

ঘ. সর্বগ্রাসী সঞ্চয়ের লোভ আর বিলাস বাসনা
ক'রেছে উন্মত্ত তাকে, নাগিনীর মতো সে নিষ্ঠুর,
প্রেমের পায়ে নাই, নাই প্রাণে বেদনা অশ্রুর,
মধ্য রাত্রে অতর্কিতে হয় না সে কখনো উন্মনা,
('একটি আধুনিক শহর')

ঙ. এসেছিল একদা যে জীবনের পরিপূর্ণ ভোজে
মহৎ সৃষ্টির শেষে মিলালো সে প্রান্তের নীলিমার!
এখানে বিস্ময়ে দেখি চিত্র শুধু ইতর সত্তার;
এ যুগের ধূর্ত কাক নর্দমায় কৃমি কীট খোঁজে ॥ ('রক পাখী')

চ. এ পৃথিবী শান্তি চায়, শান্তি চায় মানুষের প্রাণ;
সংশয়-সন্দেহ-দ্বন্দ্ব-অবিশ্বাসে রক্তাক্ত, বিক্ষত,
তারকালোকের পথে হয়তো সে চায় পরিত্রাণ; ('অশান্ত পৃথিবী')

ছ. এখানে পাবে না শান্তি উন্মাদের উৎকট হাসিতে,
এ রাত্রে পাবে না খুঁজে শান্তি আর বাণী সান্ত্বনার,
ক্রূর কুণ্ডলীতে বন্দী মুক্তি নাই তোমার আমার
সাপের ফণার নীচে মৃত্যু-তিক্ত এই শর্বরীতে। ('হিংস্র, ক্ষুধাতুর রাত্রি')

জ. মরণের মুখোমুখি এ দিনের বিষাক্ত হাওয়ায়
দুর্বিষহ জিন্দেগানি, জীর্ণ প্রথা গতানুগতিক,
এবার আসুক মুক্তি প্রান্তরের কিম্বা সামুদ্রিক
উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তি পূর্ণ হোক কানায় কানায়। ('মুক্তি স্বপ্ন')

উদ্ধৃতিসমূহে ফররুখ আহমদ অস্থির ও অসুস্থ স্বকালের নানা দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। কবিতাসমূহের নিবিড় পাঠে মনোনিবেশ করলে আমরা লক্ষ করব, কবি সময় ও সমাজের ক্ষতগুলোকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার প্রয়োজনেই ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গে ফিরে গেছেন, কিন্তু দৃষ্টিকে তিনি স্বকালেই নিবদ্ধ রেখেছেন। পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা ও অর্জনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কবি এবং এরই আলোকে উজ্জ্বল আগামী নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। কেবল এই কবিতাবলিতেই নয়, কবির নিসর্গভাবনা, প্রেম-স্বপ্ন-যৌবনভাবনা, স্বদেশভাবনা ও ঐতিহ্যচেতনা, ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-সংস্কৃতিচিন্তা, কবি-প্রশস্তি, আত্মসমীক্ষণ, আদর্শানুধ্যান ও তত্ত্বচিন্তাশ্রয়ী কবিতাবলিতেও কবির স্বকাল ও সমাজের নানা অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যাবে।

ফররুখ আহমদ রাজনীতিসচেতন কবি। কবিকন্যা সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু উল্লেখ করেছেন, প্রথম জীবনে ফররুখ উপমহাদেশের প্রখ্যাত মানবতাবাদী কমরেড এম এন রায়ের শিষ্য ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মাওলানা আবদুল খালেকের সান্নিধ্যে তাঁর জীবনধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তাঁর অনুপ্রেরণায় ফররুখ এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা, যেখানে মানুষের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান রয়েছে।' (সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু ১৯৮৮ : ২৮১)। এই বিশ্বাস তাঁকে যে কাব্যাদর্শে পৌঁছে দিয়েছে, তার সঙ্গেও রাজনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। "জড় সভ্যতার অবসান করে মানবতাভিত্তিক নতুন সভ্যতার নির্মাণের আকাংক্ষায় তিনি ইসলামের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। এই পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মাওলানা আবদুল খালেকের প্রভাব এবং সাহিত্যক্ষেত্রে কলকাতার 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' ও 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ'-এর প্রভাব কার্যকর ছিল। পরিণতিতে পুঁথি সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে মেনে নিয়ে ইসলামী-আদর্শ ও মুসলিম-ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বতন্ত্র কাব্যধারা নির্মাণে তিনি ব্রতী হলেন।" (সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ১৬২)। আবদুল হক এক স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন, পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিলেন ফররুখ। 'ভারতীয় সমাজে যে সামাজিক এবং মানবিক বৈষম্য আছে তা পাকিস্তানে সম্ভব হবে না, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান অধিকতর অগ্রসর রাষ্ট্র হবে, হওয়া উচিত, এই ছিল আমাদের ধারণা। আরো অনেকের মতো গোটা পাকিস্তান আন্দোলনই আমাদের চোখে একটা রোমান্টিকতা মণ্ডিত ছিল। রাজনৈতিক আদর্শের এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হতো এবং এই সূত্রেই ফর্‌রুখ আহমদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।' (আবদুল হক ১৯৮৮ : ২৪)। পাকিস্তান আন্দোলনের সূত্রেই ফররুখ আহমদ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পথপ্রদর্শক মুহম্মদ মুস্তফা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সূচনাসূত্রেই আমরা উল্লেখ করেছি, তাঁর কবিতার বৈষয়িক পরিমণ্ডলে অত্যন্ত প্রভাবশালী দিক ইসলামী জীবনাদর্শের রূপায়ণ। এর ফলে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণে মনোযোগ দিয়েছেন। পুথিসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগের অনুপ্রেরণাও পাকিস্তান আন্দোলন থেকে উৎসারিত। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> বর্তমানের হতদশা থেকে মুক্তিলাভের জন্য মুসলমানদিগকে শুধু ইসলামে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়ে কবি সন্তুষ্ট থাকেন নি, একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসরণের দ্বারা ও একটি বিশেষ ভূখণ্ডের ভিত্তিতে কিভাবে নতুন জাতির বিকাশ হতে পারে, সে-সম্পর্কেও তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। হজরত মোহাম্মদ ও তাঁর চার খলীফার জীবনের সমুন্নত আদর্শের মধ্যে কবি তাঁর ঈপ্সিত আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্বিতীয় আকাংক্ষার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে ভেবেছিলেন। 'সিরাজাম মুনীরা' ও 'আজাদ করো পাকিস্তান' কাব্যদ্বয়ে দুই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রথমটি পাকিস্তান-আমলে প্রকাশিত হলেও অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছিল প্রাক-পাকিস্তান যুগে। (সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ১৬৩)

ফররুখ আহমদ রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন না, কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনই তাঁর কবিতার বৈষয়িক পরিমণ্ডল নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই আন্দোলনের আদর্শকে তিনি জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর জীবনে কখনো এই আদর্শের বিচ্যুতি ঘটে নি। তাঁর *হাতেম তা'য়ী* কাব্যে আমরা যে ইসলামী ঐতিহ্যের অনুসরণ লক্ষ করি, তা পাকিস্তান আন্দোলনেরই ফল। এমনকি তাঁর প্রথম কাব্য *সাত সাগরের মাঝি*তেও আমরা লক্ষ করি, প্রথম যুগের মুসলমানদের নির্মিত আদর্শের ভিত্তিকে গ্রহণ করার প্রয়াস এবং আবার সেই স্বপ্নজগতে ফেরার অভিপ্রায়। এ-প্রসঙ্গে কয়েকজন সমালোচকের মন্তব্য উপস্থাপন করছি :

> ক. ফররুখের প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের মাঝেই, কিন্তু সে সংগ্রামের মধ্যে তখন বিক্ষিপ্ততা নেই, এ সংগ্রাম একটা চরম পর্যায়ে সুস্পষ্ট গতিপথ বেছে নিয়েছে। গোটা সমাজ সেদিন আত্মনিয়ন্ত্রণ আর আত্মপ্রতিষ্ঠার জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। বহু শতাব্দীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংগ্রাম ও অভিযানমুখর মুসলিম মানস একটা আবাসভূমি পাবার স্বপ্নে বিভোর। এই পটভূমিতেই সফরক্লান্ত সিন্দাবাদকে খাকের স্বপ্নে বিহ্বল দেখিয়েছেন ফররুখ। (আবদুল গফুর ১৯৮৮ : ৩৭৭)
>
> খ. পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে রেনেসাঁ আন্দোলনের সময়েই তিনি সচেতন প্রয়াসে কাব্যে মুসলমান ঐতিহ্যের ব্যবহার, বিশেষ করে চলতি ভাষার পুঁথি কাব্যের নবরূপায়ণের দিকে দৃষ্টি দেন। আরব্য উপন্যাসের 'সিন্দাবাদ' কাহিনীকে প্রতীকী উপস্থাপনার মাধ্যমে ফররুখ আহমদ নতুন ব্যঞ্জনায় ও গভীর তাৎপর্য মহিমায় মূর্ত করে তোলেন। (মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ ১৯৮৮ : ৪৬৪)
>
> গ. প্রথম যুগের মুসলমানেরা ইসলামের বাণীতে একতাবদ্ধ হয়ে অর্ধ-পৃথিবী জুড়ে যে-বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল এবং আনন্দ-ঐশ্বর্য ও মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে যে-নতুন সমাজ-সৃষ্টিতে ব্রতী হয়েছিল, বর্তমানের মুসলমানদের জন্যও কবি ঐ-সমাজ কামনা করেছেন। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় ঐ-স্বপ্নের যুগে প্রত্যাবর্তনের ও তার উদ্‌বোধনের আহ্বান রয়েছে এবং স্বপ্নিল ভাষায় কবি অতীত যুগের প্রাণোচ্ছলতা, ঐশ্বর্য, দুঃসাহসিকতা, শক্তি ও সংগ্রামের ছবি অংকন করেছেন। সিন্দাবাদ, বা'র দরিয়া, দরিয়ায় শেষ রাত্রি, আকাশ-নাবিক, পাঞ্জেরী, নিশান, সাত-সাগরের মাঝি প্রভৃতি কবিতায় তাঁর মনোভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। (সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ১৬২)
>
> ঘ. 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' পাকিস্তান আন্দোলনের সমসূত্রে যে আত্মনিয়ন্ত্রণী সাহিত্যান্দোলন শুরু করেছিলেন, সে আন্দোলনের যথেষ্ট সমর্থনই ফররুখ আহমদের কাব্যে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ 'সোসাইটি' ঘোষিত সাহিত্যান্দোলনের লক্ষ্যে পৌঁছতে কোন সাহিত্যিক যদি কিছুমাত্র সার্থকতা অর্জন করে থাকেন, তা হলে তিনি ফররুখ আহমদ ছাড়া আর কেউ নন। (সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৮ : ২৫)

উদ্ধৃতিসমূহ থেকে ফররুখ আহমদের রাজনৈতিক বিবেচনার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব। রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন থাকলেও কবিতাকে তিনি রাজনৈতিক শ্লোগান করতে চাননি। মানবিক মূল্যবোধের অভাবকে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অশান্তির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লড়াইয়ে সাফল্য অর্জনের প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জনে তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসের শরণ নিয়েছেন। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, ফররুখের 'ধর্মবোধ তাঁর মজ্জাগত, কিন্তু সাধারণ ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্যে যে জীবনদৃষ্টির সংকীর্ণতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি উপেক্ষা দেখা যায়, ফররুখের সাহিত্যকর্ম তার থেকে আশ্চর্যরূপে মুক্ত।' (২০০৮ : ২৫)। ধর্মবোধের মতোই রাজনৈতিক অভিব্যক্তি তাঁর জীবনবোধের অনিবার্য অংশ হওয়ায় তাঁর কবিতায় রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট বিষয়-আশয়ের উপস্থানও কখনোই আরোপিত মনে হয় না, তাঁর কাব্যাদর্শের অনিবার্য অংশ হিসেবেই তা গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ফররুখ আহমদের সাহিত্যকর্মে ১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ। বাংলা ভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার শৈল্পিক নিদর্শন রেখে গেছেন তিনি। ধর্মীয় সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে ভাষার প্রতি বিরূপ আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি এবং তাঁর সেই সমালোচনার ভাষাও সংহত ও শৈল্পিক, অর্থাৎ কবিতারই ভাষা। তাঁর ব্যঙ্গ-কবিতার দিকে দৃষ্টি দিলে এর যথেষ্ট প্রমাণ মিলবে। ১৯৪৫ সালে *মোহাম্মদী*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'উর্দু বনাম বাংলা' শীর্ষক একটি ব্যঙ্গ-কবিতার উল্লেখ করেছেন ফররুখ-জীবনীকার আবদুল মান্নান সৈয়দ, যা পরবর্তী কালে কবির *অনুস্বার* কাব্যে সংকলিত হয়েছে। প্রসঙ্গত এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

> দুই শো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন
> বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা।
> বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা
> উর্দু নীল আভিজাত্যে (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)
> আত্‌রাফ রক্তের গন্ধে দেখি আজ কে করে বমন?
> ('উর্দু বনাম বাংলা'/*অনুস্বার*)

ফররুখের ভাষা-প্রীতির চমৎকার নির্দশন মিলবে *মুহূর্তের কবিতা* কাব্যের দুটি কবিতায়। এই কবিতাদ্বয়ে ভাষার মাধ্যমে যে দেশপ্রেমের পরিচয় মুদ্রিত, সঙ্গত কারণেই সেই দেশ পাকিস্তান, কিন্তু ভাষা কীভাবে একটি জাতির সংস্কৃতিকে লালন পালন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে, সেই বিষয়ে তাঁর সচেতনতা এই কবিতাদ্বয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাকে সংস্কৃতের দুহিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যে ষড়যন্ত্র

করেছেন সংস্কৃতবাদীরা, তাঁদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন কবি। দুইটি কবিতা থেকেই অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

ক. কবির বিস্মিত দৃষ্টি (ফকীরের প্রোজ্জ্বল চিরাগে
যেমন দ্বীপের রোশ্‌নি চট্টলের বিস্মিত শহরে,
পাহাড়তলীতে, গ্রামে) জীবনের পূর্ণ অনুরাগে
খুঁজে ফেরে সে সঞ্চয় ফসলে ও পুষ্পল প্রান্তরে ॥
('অশেষ ঐশ্বর্য'/*মুহূর্তের কবিতা*)

খ. কে বলে দুহিতা কার? কোথায় বা সে মৃতা জননী
গিয়েছিল পথে রেখে যে কেবলি বাড়ায়ে জঞ্জাল?
কলঙ্ক কাহিনী নিয়ে ছিলে জেগে তুমি কত কাল
কে জানে সে কথা? আর প্রতীক্ষার দীর্ঘ রাত গণি
কাটায়েছো কতকাল জীবনের চেয়ে পদধ্বনি
অস্পৃশ্যা নারীর মতো বর্ণশ্রম শৃঙ্খলে পীড়িতা
পরিত্যক্ত 'পক্ষি ভাষা'? পাদপিষ্টা, মৃত্যুভয়ে ভীতা
কখন পিঞ্জরে প্রাণ উঠিল আবার রনরণি?
('বাংলা ভাষার প্রতি'/*মুহূর্তের কবিতা*)

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেও অবস্থান নিয়েছেন ফররুখ। তিনি অনুধাবন করেছেন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হলে পূর্ব-বাংলার মানুষের আত্মপ্রকাশের সকল পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং মানুষের মুক্তির যে স্বপ্ন তিনি লালন করেন তাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই তিনি ভাষার প্রশ্নে কখনোই আপস করেন নি। ফররুখের গদ্যসাধনার জগৎ সীমিত হলেও ভাষা-প্রশ্নে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য তিনি কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গদ্যেরও আশ্রয় নিয়েছেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে *সওগাত*, আশ্বিন ১৩৫৪ সংখ্যায় 'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে বাদানুবাদ চলছে। আর সবচাইতে আশার কথা এই যে, আলোচনা হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, জনগণ ও ছাত্রসমাজ অকুণ্ঠভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছে। সুতরাং এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে। যদি তাই হয়, তাহলে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। (উদ্ধৃত, আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩ : ২০)

ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। কিন্তু এর জন্য বাংলার কয়েকজন সাহসী সন্তানকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। ফররুখ তাঁর

কবিতায় সেইসব বীর সন্তানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। বীরের রক্তস্রোত কখনো বৃথা যেতে পারে না বলে বিশ্বাস করেন ফররুখ। কোন জাতি যখন দেশ ও মানুষের কল্যাণে নিবেদিত বীরসন্তানদের সম্মান ও স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়, সেই জাতির ভবিষ্যতও অন্ধকারে নিপতিত হয় বলে মনে করেন তিনি। ফররুখের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে ৪ জানুয়ারি ১৯৬৪ সালে লেখা একটি ছোট্ট কবিতা উদ্ধার করেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। আমরা পুরো কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান,
সংগিনের মুখে যারা দাঁড়ায়েছে নিষ্কম্প, অম্লান,
মানে নাই কোন বাধা, মৃত্যুভয় মানে নাই যারা
তাদের স্মরণচিহ্ন এ মিনার – কালের পাহারা!
এখানে দাঁড়াও এসে মনে করো তাদের সে-দান
যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান।
('ভাষা-আন্দোলনে নিহত আত্মার প্রতি')

ভাষা-আন্দোলনে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আহ্বানই এই কবিতার শেষ কথা নয়, বরং শহিদমিনারকে 'কালের পাহারা' হিসেবে চিহ্নিত করে কবি ভাষা-আন্দোলনের চেতনার সঙ্গে আমাদের একাত্ম হতে বলেছেন। একজন সমালোচক লিখেছেন :

> ভাষা-আন্দোলনকেন্দ্রিক কবিতাবলি বাংলাদেশের কাব্যপ্রবাহে সঞ্চার করেছে ঐতিহাসিক মাত্রা। ভাষা-আন্দোলনকেন্দ্রিক কবিতাবলি ভাষার দাবির সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশের জনচিত্তে ছড়িয়ে দিয়েছে স্বাধিকারের বাসনা। বস্তুত, আমাদের কবিতাকে ইতিবাচক রাজনৈতিক চেতনায় ঋদ্ধ করতে ভাষা-আন্দোলনকেন্দ্রিক কবিতাবলি পালন করেছে পথ-নির্দেশকের ভূমিকা। (বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০০৩ : ১২১)

ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক কবিতাবলি 'পথ-নির্দেশকের ভূমিকা' পালন করেছে বলে উল্লেখ করেছেন সমালোচক। আর 'যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান', মৃত্যুভয়হীন সেই বীর-সন্তানদের উদ্দেশ্যে ফররুখ আহমদ লিখেছেন, 'তাদের স্মরণচিহ্ন এ মিনার – কালের পাহারা'। ফররুখ আহমদের শৈল্পিক উচ্চারণের সঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষের বিবেচনা গভীর সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত বলে আমরা মনে করি। বাঙালির জাতীয় চেতনাকে ধ্বংস করার পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র কবিকে আহত করেছে। নিভৃতচারী কবি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের চেষ্টা করেন নি কখনো, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রশ্নে তাঁর আপসহীন অবস্থান থেকে আমরা বাঙালির ভবিষ্যৎ বিষয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ অনুধাবন করতে পারি।

ফররুখের কাব্যবিষয়ের কেন্দ্র চিহ্নিতকরণের প্রয়াসে সমালোচকবৃন্দ ফররুখের কবিতায় বহুল ব্যবহৃত কিছু অনুষঙ্গের ওপর নির্ভর করেছেন। এমনকি তাঁর কাল-

সচেতনতাও কতিপয় অনুষঙ্গের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অবয়ব লাভ করেছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> তিনি সময়ের ভিতর দিয়ে, অনেক সময় ইতিহাসের চশমায়, বর্তমানকে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি সমকালের সামনাসামনি দাঁড়াতেন, সেসব ক্ষেত্রে তাঁর দাঁড়ানোর যতখানি ঋজুতা দেখা যেত, তার থেকে বেশী দেখা যেত অনুভূতি। সমকাল ও কালের সমস্যাগুলির সংগে তিনি একাত্ম ছিলেন। তাঁর কবিসত্তার বড় অংশটি এই কালের সংগে নাড়ীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তাই তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে একই কেন্দ্রে ফিরে আসার এত আয়োজন। (সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ১৯৮৮ : ৫৯৩)

সমালোচকের এই বিবেচনা ফররুখের কবিতায় বিম্বিত কালসচেতনতার স্বরূপ অনুধাবনে সহায়ক বলে আমরা মনে করি। কবি হিসেবে ফররুখ আহমদ 'কালের সঙ্গে নাড়ীবন্ধনে আবদ্ধ' ছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনা কেবল স্বকালের নিখুঁত বর্ণনা-বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ নয়, বরং কবিতা তথা শিল্পের দায়ও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। ফররুখের কবিতায় 'ঘুরে ফিরে একই কেন্দ্রে ফিরে আসার' যে বিচিত্র আয়োজন লক্ষ করেছেন সমালোচক, সেই কেন্দ্রীয় শক্তিকে স্বকালের নাড়ীর নিকটবর্তী থাকার অভিপ্রায় হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব।

ফররুখ আহমদ স্বকালের হৃৎস্পন্দন ধারণ করেই কবিতার সঙ্গে সংসার করেছেন। সমাজজীবনের বিবিধ অসঙ্গতি তাঁর কবিতায় বিচিত্র অবয়বে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজনীতি সমাজজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে বলেই রাজনৈতিক অনুষঙ্গকে তিনি কবিতার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর মনে করেন নি। জীবনাদর্শের অনুকূল ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শরণ নিয়ে তিনি তাঁর সময় ও সমাজের আর্তনাদকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। যে ভাবাদর্শ ফররুখের শিল্পাদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের প্রয়োজনেই তিনি বিশেষ কিছু রূপকল্পের উপর্যুপরি ব্যবহার করেছেন। ফররুখ আহমদ অনুভব করেছেন, একজন স্বকালসংলগ্ন কবি সমাজসম্পৃক্তির দায় এড়াতে পারেন না। তাঁর সময়ভাবনা বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষঙ্গে উজ্জ্বল ও অভিনব রূপ লাভ করেছে। বর্তমান সময় ও সমাজের ক্ষতস্থানসমূহকে তিনি চিহ্নিত করেছেন এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি অতীতের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ ও ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গের শরণ নিয়েছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল গফুর (১৯৮৮), 'আতিথ্যে উদার আদর্শে নিরাপোষ', *ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহমদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আবদুল গফুর (১৯৮৮) । 'ফররুখ-মানস : তাঁর কবিতা', *ফররুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৮৭), *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, মুক্তধারা, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৮৮), *ফররুখ আহমদ*, জীবনী গ্রন্থমালা ১৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৯৩) । *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৯৫) [সম্পাদক], *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আবদুল হক (১৯৮৮) । 'ফররুখ আহমদ', *ফররুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

গোলাম মঈনউদ্দিন (১৯৮৫) । *কবি ফররুখ আহমদ : ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

ফররুখ আহমদ (১৯৯৫) । *ফররুখ আহমদ রচনাবলী* (সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ), প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বুদ্ধদেব বসু (১৯৫৯) । *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য*, দ্বিতীয় সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

বিনতা রায়চৌধুরী (১৯৯৭) । *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য*, সাহিত্যলোক, কলকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৩) । *কথাগুচ্ছ গুচ্ছকথা*, গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা.) লিমিটেড, ঢাকা

মনিরউদ্দীন ইউসুফ (১৯৮৮) । 'ঐতিহ্যের রূপকার ফরুরুখ', *ফররুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

মুহিউদ্দীন খান (১৯৮৮) । 'স্বপ্নরাজ্যের দুঃসাহসী সিন্দাবাদ', *ফররুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ (১৯৭৮) । *সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, মুক্তধারা, ঢাকা

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ (১৯৮৮) । 'ফররুখের কবিতা : তাঁর শিল্পরূপ', *ফররুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান (২০০২) । *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬) । *কণিকা*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬), *ঘরে-বাইরে*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা

শাহাবুদ্দীন আহমদ (১৯৮৮) । 'ফররুখের অভিনবত্ব', *ফররুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

শাহাবুদ্দীন আহমদ (২০০২), *মুসলিম রেনেসাঁসের কবি ফররুখ আহমদ*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা

সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু (১৯৮৮)। 'আব্বাকে যেমন দেখেছি', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সাঈদ-উর রহমান (২০০১)। *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৮)। *কবি ফররুখ আহমদ*, তৃতীয় মুদ্রণ, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (১৯৮৮)। 'কাল-সচেতন ফর্‌রুখ', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

স্বপন সেনগুপ্ত (২০০৪)। *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা কবিতা*, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, কলকাতা

হাসান আবদুল কাইয়ুম (১৯৮৮)। 'আমাদের চেতনার উচ্চারণে ফর্‌রুখ', *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা